চিন্তাশীল মেশিন

লুবনা চর্যা

চিন্তাশীল মেশিন

লুবনা চর্যা

Chintasheel Machine
A book of poems by Lubna Charya

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০
গ্রন্থস্বত্ব লেখক
প্রকাশক
ঘোড়াউত্রা প্রকাশন
৫০ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৯১৯ ১১৫১১৫, ghorautra@outlook.com

প্রচ্ছদ লুবনা চর্যা

গ্রন্থসজ্জা সুমন দীপ

মুদ্রণ মুক্তি প্রিন্টার্স
মিরপুর ১, ঢাকা-১২১৬

মূল্য
৪০ টাকা, US $ 1

আপন প্রেমিক

আমার গায়ে তাহার গন্ধ। তাহলে এখন আমি একটা মানুষের কায়ায় দুইটা মানুষ? দুইটা জমজ প্রেমিক?

তাহার গন্ধ যেন এমন এক সুগন্ধী সাবান, যা আমি অন্য কোন কুচক্রী সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাই না।

চোখ যাকে দেখতে পায় না, কান যাকে শুনতে পায় না, হাত পারে না স্পর্শ করতে, দূরত্ব যাকে সরিয়ে রাখে দূরে- গন্ধ সেখানে মিলনের একমাত্র বুনো পথ। তোমার গন্ধ এমনভাবে আগলে রাখি যেমন করে অন্ধকার ঝড়ের রাতে কোন গ্রামের কিশোরী বাতাসের অসংখ্য সরু সরু জিভ এড়িয়ে হাতের প্রদীপটা বাঁচিয়ে খুঁজতে বের হয় ঘরে না ফেরা হাঁসের পাল।

তুমি থাকো না বলে তোমার গন্ধ মহাকাশে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে আমার পাশে- তোমার রেপ্লিকা সেজে।

পৃথিবীর সকল প্রেমিককে যুদ্ধবন্দীর মতো সারি বেঁধে দাঁড় করানো হলে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে সেখানে যদি আমাকে আনা হয়- তাহলে রিভলবার গর্জে ওঠার আগেই গন্ধ শুঁকে খুঁজে নেবো আপন প্রেমিক।

এক ঝাঁক সবুজ পাখি

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখি, এক ঝাঁক সবুজ পাখি নাচতে নাচতে উড়ে যাচ্ছে। বহু বহু বহু শতাব্দী ধরে মানুষ দেখতে দেখতে ক্লান্ত আমার চোখ দুইটাও খুশিতে নেচে ওঠে। চোখের জানালা দিয়ে অসংখ্য শিশু হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলে: “টিয়া পাখি, ঐ যে টিয়া পাখি”! আমি সেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আমিও তাদের সাথে আমার চোখের জানালা দিয়ে উঁকি মারি।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

সবুজ পাখিগুলো যেসব শহরের উপর দিয়ে উড়ে যায়, সেইসব শহরের দালান কোঠার দরজা-জানালা-ফার্নিচার কাঠ থেকে আবার হয়ে যায় গাছ। ইটগুলো খসে খসে জড়ো হয়ে হয়ে যায় মাটি। পৃথিবীর ব্যস্ততম শহরগুলো নিমেষে হয়ে যায় নিস্তব্ধ অরণ্য। হঠাৎ সেই অরণ্যে ট্যাংক, কামান, রাইফেল নিয়ে সশব্দে ঢুকে পড়ে একদল শিকারী। যারা পাখিদের হত্যা করে তারাই তো বোমা ফেলে শিশুদের স্কুলে।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

আমি সভয়ে তাকাই মানুষের দিকে। কারণ আমি জানি, মানুষ পাখির মাংস রোস্ট করে খেতে পছন্দ করে। আমিও যে মানুষের ছদ্মবেশে একটা পাখি- এই কথা জানার পর ওরা কি আমাকেও রোস্ট করে খেয়ে ফেলবে? চুপিসারে ভীষণ সংখ্যালঘু ক্রাইসিসে ভুগতে থাকি।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

এজন্যই মনে হয় পাখিরা দল বেঁধে চলে আর মানুষ দল ছাড়া চলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কারণ দলগত মেলামেশাকে সে তার নিজস্ব খ্যাতি, ক্ষমতা আর টাকা-পয়সার প্রতিবন্ধক মনে করে। মানুষের

দলগত প্রয়াসগুলো এভাবে ব্যক্তিক আত্মম্ভরিতার কাছে বিপর্যস্ত হয়।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

যেমন আমি মানুষ রূপে এক ছদ্মবেশী পাখি, তেমনি মানুষ রূপের ছদ্মবেশে আছে অনেক হরিণ, মাছ, শিয়াল, নেকড়ে, খরগোশ, শামুক, কুমির, মৌমাছি, অজগর, জেব্রা ইত্যাদি। বস্তুত অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ গড়ে নিয়েছে এক মানবিক জঙ্গল। আরণ্যক সবকিছুই এখানে ঘটে অর্থাৎ “জোর যার, মুলুক তার”- তবে তা ঘটে আইন ও প্রশাসনের দোহাই দিয়ে।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

বন্যতাই যদি থাকবে, তাহলে তাকে সভ্যতার ছদ্মবেশে দেখাতে হবে কেন? যেমন আমরাও বাধ্য হই কেন পাখি, পোকা বা হায়েনা হৃদয় নিয়ে মনুষ্যত্বের অভিনয় করতে? অভিনয় নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্যজনক প্রতিভা, কিন্তু সারাক্ষণ অভিনয় করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। সবুজ পাখিরা তাই অভিনয় করতে চায় না। তারা কোথাও অডিশন দিতে বা স্ক্রিন টেস্ট করাতেও যায় না। শুধু দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে নাচতে নাচতে উড়ে চলে যায় চোখের সামনে দিয়ে।

ঢিং ডাং ঢিং ডাং ঢিং ডাং... স্কুলে ঘন্টা বাজে
সবুজ সবুজ পাখিরা নীল আকাশ জুড়ে হাসে

নারকীয় ভগিনীগণ

মহাকাশের এ জমকালো আঁধারে খসে যাওয়া উল্কার
পিঠে চড়ে নারকীয় ভগিনীগণ, চলো করি একসাথে
নৈশভোজ। রাতের গলিত অন্ত্র, ফুসফুস, রক্ত পেটে নিয়ে
কাঁটাচামচ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবো বহুক্ষণ ধরে
আর কোল্ড ড্রিংকস হিসাবে পাশে থাক
এক গাস ঠাণ্ডা মেঘময় বাতাস।

শৈত্যপ্রবাহের মতো এভাবে হি হি করে যেন হাসি বারোমাস।
বিরল হজমতন্ত্রের কারণে আমাদের
কান্নাগুলো সব হয়ে যায় অট্টহাসি-
হাসি হয়ে যায় প্রেমিকের গলায় ফুলের মালার ফাঁসি।
আমাদের দৃষ্টি এতোই এসিডসমৃদ্ধ যে
গাছপালা পুড়ে ছাই, গবাদিপশুরা বিকল
আঁতুড়ঘরে শিশুরা হয়ে যায় ঝুড়িভর্তি পোকাওয়ালা ফল।
ভালবেসে তাই সবাই আমাদেরকে ডাকে
ডাইনী, পিশাচী, ঘৃণ্য আত্মার জন্তু-
কিন্তু আমরা আসলে পেকে কালো হয়ে যাওয়া তরমুজ।
বাইরে শক্ত সবুজের খোলস, ভিতরে লাল মিষ্টি দ্রবণ।

তারা খসা এ রাতের মধ্যযামে
কুৎসিত ভগিনীগণ, এতো কালো যে প্রায় অদৃশ্য-
চলো খুলে দেই একে অপরের কাছে
হৃদয়ের নিষিদ্ধ ভল্ট, সাগর সেঁচা মুক্তার রেণু..
রাতের নৈঃশব্দ্যের শব্দে যদি হয়
কিছু আগুনে ভেজা আপ্তবাক্য বিনিময়।

বৃষ্টি, বন্ধু ও আমি

পুরানো, অব্যবহৃত কোন কঙ্কাল জাহাজের কেবিনের মতো
পৃথিবীর নিঃসঙ্গ পিঠে বৃষ্টি নামলে
সুন্দর হয়ে ওঠে মরা পঁচা মাটি, ঘা-চুলকানি ভরা ঘিজঘিজে বাগান।
সব কুৎসিত দৃশ্যের ভিতর থেকে ভেসে ওঠা ডাইনীরা
চেহারা বদলে বনে যায় সমুদ্রদেবী
কিংবা বুড়ো রংধনুর ঘর ভরা মেয়ে।

গাছহীন মরু শহরে সতেজ পাতার উৎসাহ নিয়ে জ্বলে ওঠা
গ্রিন সিগনালে ভেড়ার পালের মধ্যে ভীতু, কিম্ভূত একটা ভেড়া হয়ে
রাস্তা পার হতে গিয়ে মহাকাশ ঘুরে ফিরে এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে হাতে।
বেডের কিনারার মতো চোখ চকচক করে ওঠে তাতে।
সেই বৃষ্টির ফোঁটাটা রাশভারী কোন বিউটিশিয়ানের মতো
বলে কানে কানে: জানো, তোমাদের সব খারাপ, নোংরা, বিশ্রী
আমি সুন্দর করে দিতে পারি
শুধু যুদ্ধক্ষেত্রগুলাকে পারি না একটুও সুন্দর করতে।
পাশে হাঁটা আমার জন্মান্ধ ফটোগ্রাফার বন্ধু
মুচকি হেসে বললো: কিন্তু আমি পারি। ফটোশপ দিয়ে
সবকিছু বদলে ফেলা যায়। শুনে বৃষ্টির ফোঁটা বললো:
তার আগে যেন আমার মরণ হয়। বল সে ধপ করে
বালু ছড়ানো কংক্রিটের রাস্তায় পড়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
বধির আমি, যে কেবল বৃষ্টি, বাতাস আর
পাখিদের কথাবার্তা শুনতে পায়।
আর আমার জন্মান্ধ ফটোশপ মাস্টার বন্ধু চলন্ত ট্রাকের
মৃত্যুসীমা থেকে লাফিয়ে পড়ি জীবনের প্রান্তসীমায়
এমন এক সভ্যতায়, যেখানে যুদ্ধে মৃত শিশুদের

চোখের তারা দিয়ে জ্বালানো হয় রাতের সব তারাদের।
হাড়গোড় দিয়ে বানানো হয় সংসদ ভবনের দুর্গম গেট
আর বৃষ্টিবিহীন ফুল ক্ষেতের পোকায় ধরা ফ্যাকাসে ফুল
রঙিন করতে স্প্রে করা হয় ওদের উষ্ণ রক্ত।
এমনকি ইদানিং সূর্যের অ্যানিমিয়া ধরা পড়ার পর প্রতিদিন
কিছুটা করে রক্ত ছিটাতে হয় অস্তগামী আকাশে।

যেতে যেতে রাস্তার পাশে নামফলক লেখা কয়েকজন বিপ্লবীর
কবর দেখে আমরা দুই বন্ধু কিছুতেই বুঝতে পারি না যে,
এরা কেন সবকিছু পরিবর্তনের জন্য জীবন দিলো?!
আমার বন্ধুটা আমার চেয়ে বেশি স্মার্ট আর বুদ্ধিমান-
সে বললোঃ দোস, তখন ফটোশপ ছিল না তো!!!

দানবিক শকুনি

বহুদূরে নরকের শেষপ্রান্তের কিনারে আর পৃথিবীর শুরুর একটু পরে ছিল এক অজ্ঞাত নামের সমুদ্র। নরকে কালো কালো, বেঁটে, পরিপুষ্ট হাড্ডি, থ্যাবড়ানো নাকের জঘন্য কয়েদীদের ঘন বিষাক্ত তামাটে নিঃশ্বাসে আর আমাদের একের থেকে অন্যের বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে ছত্রাকের মতো জন্ম নেয়া নো ম্যানস ল্যান্ডের দীর্ঘশ্বাসে ক্লেদ ময়লা জমে জমে সেই স্বচ্ছ সমুদ্রের পানি হয়ে উঠেছিল শয়তানের আত্মার চেয়েও পঙ্কিল আর বিশ্রী। ডাকিনী কুৎসিত সমুদ্রটা কুচক্র করে তারই প্রতিচ্ছবি ছড়িয়ে রেখেছিল সমস্ত আকাশের স্ক্রিনে। যাতে ঘুম ঘুম চোখে কোন শিশু দেখতে না পায় তারাদের ম্যাজিক। কোন প্রেমিক চাঁদকে দেখে দেখে আঁকতে না পারে অভিমানী প্রেয়সীর মুখ। গরমে কুকুরের মতো জিভ ঝোলা শ্রমিকরা আকাশের নোংরামি দেখে মনে মনে যেন প্রত্যাশা না করে বৃষ্টির দেবদূত। ঈশ্বর থেকে শয়তান অবধি সবাই প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব। শুধু মানব প্রজাতি স্বাগত জানিয়ে দুবৃত্ত সমুদ্রটাকে তার পুরনো ঠিকানা থেকে তুলে এনেছিল তাদেরই অ্যাপার্টমেন্টের কালো কাঁচে ঘেরা অ্যাকুরিয়ামে।

আমি এক ভয়াবহ দুরারোগ্য রোগ- তোমার ঘাতক হয়ে উঠছি বেড়ে অ্যাকুরিয়ামে তোমারই পোষা নীল তিমির দেহের গরাদে। চতুর শিয়াল যখন তোমাদের অবসন্ন মগজ চুরি করে খায় গভীর রাতে। নৈশভোজন জমে ওঠে কবরখানায় সারি সারি আঁধারের চেয়ারে। মিথ্যার মতো শক্ত একটা হাতুড়ি দিয়ে সরলতার আয়নাটাকে তুমি প্রতিদিন ভাঙো গুহা থেকে বাইরে বেরোবার আগে। এমনকি গুহার ভিতরেও পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র প্রেমিকার সাথে, প্রেমিকা মায়ের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে- তোমরা খেলে যাচ্ছো একই ধূর্ততার জালে বোনা শিকার শিকারী খেলা। সেই খেলাতে যতো বেশি গোল হয়, ততো জীবন্ত হয়ে উঠি আমি। আমার জীবন্ত হওয়ার সাথে সাথে মরে যেতে

থাকে ড্রইংরুমের অ্যাকুরিয়ামে ঝাঁকে ঝাঁকে নীল তিমি। যতো তুমি নিজেকে চালাক প্রমাণিত করার অসার আনন্দে নেচে ওঠো অন্যকে বোকা বানানোর নেশার গরিমায়- ততোই তোমাদের প্রতিটা বাক্সবন্দী ঘর উপচে পড়ে মৃত তিমির হাড়ের স্তূপে। যে তিমিগুলো তোমাদের সুরুচির পরিচয় দেবে বলে সমুদ্রের জঠর থেকে ছিনতাই হয়ে প্রতিশোধ নেয় তাদের লাশের ভারে তোমাদেরকেই আবার পিষে ফেলে। মরা তিমির নিস্তব্ধ হাটে আসে না কোন সুন্দরী পাখি, আসে শুধু পাখির ছদ্মনামে এক দানবিক শকুনি।

অসময়ের শরৎ মেঘ

বৃষ্টির ভাড়া নেওয়া এই সিজনাল আকাশে
ঘুরে বেড়ায় গুপ্তচর শরতের মেঘ।
ও মেঘ! তুমিও কি আমার মতো অসময়ে
জন্ম নেয়া ভোগান্তি শিশু?
গুণের জন্য প্রশংসা নয় বরং বিদ্রুপই
আমৃত্যু ছাড়বে না যার পিছু।

এমন সময়ের হাত ধরে মঞ্চে উঠলাম
যে নিজেই নিঃশব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আমার হাত।
সেই ব্যথা দাঁতে চেপে গান গেয়ে গেলাম-
তোমাদের হাততালিও পেলাম অগুণতি
অথচ কেউ টের পাচ্ছে না নিঃশব্দে
ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আমার পোড়া কপাল।

ও সাদা মেঘ! তুমি কি খুব পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসো?
তোমার পিঠে চড়তে পারে শুধুই অ্যাঞ্জেল?
কিন্তু আমি যে কুৎসিত, জঘন্য দুর্গন্ধময় এক শয়তান-
তাই ভালবাসি নোংরা কালো বস্তার মতো মোটা তাজা মেঘ
যে মেঘ তার ছলচাতুরি ন্যাকা কান্নায় ভিজিয়ে দেয়
আমার মরুভূমি হয়ে যাওয়া অভিশপ্ত দীর্ঘায়ু।

তোমাকে বাইরে পাঠিয়ে আমি পাঠাতে পারি না
দুশ্চিন্তাকে মনের বাইরে।
আমাকে ভিতরে রেখে গিয়ে তোমারও একই অবস্থা।
বুনো বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার আদুরে কোলে।

অনেকদিন পর ফিরে পেয়ে চায়ের কাপই
পান করতে থাকে তোমাকে।
তারা ঝরে যেখানে তুমি বসে আছো তার পাশেই ঝোপে ঝাড়ে।
তবু আমার সব দুশ্চিন্তা তোমাকে নিয়ে।
কেননা শুনেছি কবর ভেঙে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসা ড্রাকুলা
যেখানে সেখানে মানুষের রক্তে মেটায় তাদের অসীম তৃষ্ণা।
তাহলে কি বিয়ের আগেই বিধবা হবো আর
নগ্ন শরীরে পেঁচিয়ে নেবো অসময়ের শরৎ মেঘ?!

একটা গুলির শব্দ এক মুহূর্ত থমকে দেয় সবকিছু-
সেই মুহূর্তে একই ভয়ে হারিয়ে গিয়েছিল সবাই,
প্রিয় কাউকে হারাবার বিষম ভয়।
ভয়ে ভয়ে আমিও চিৎকার করি ধরে তোমার নাম-
কিন্তু ওটা ছিল শুধুই একটা ফাঁকা আওয়াজ
শিমুল তুলার বোঁচকার মতো নাক বোঁচা ফর্সা মেঘ বরাবর।
তারপরই বৃষ্টি নেমে ধুয়ে দিলো জাগতিক শাস্তি-
কিছু সময়ের জন্য অন্তত এ শাস্তির বিজ্ঞাপন বিরতি।

পতন

ছাদের ভবঘুরে খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়ে বেরিয়ে থাকা রডে এক বিন্দু বৃষ্টি লেগে আছে। সেই বৃষ্টির ফোঁটার আয়নায় আকাশ দেখছে নিজেকে। হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটার ভিতরে আকাশটা কেঁপে ওঠে। রডের ডগা থেকে বহুদূরের নিচে টলে পড়ে যায় ফোঁটাটা। আমি ভচকানো বিয়ারের ক্যানের মতোন ওর ভয়ার্ত মুখ দেখি। এতো উপর থেকে পড়ে ও কিভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে! আজকাল আমারও ভীষণ ভেঙে যাওয়ার ভয় করে। ধ্যাৎ, আমি কি কাঁচের প্লেট নাকি যে পড়লেই ভেঙে যাবো!

তারপরও সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত-বারোমাস ভাবনা হয়, যদি পড়ে যাই, ভেঙে যাই- এই ভয়ই দেখায় ভয়। মনে হয় লিফট ছিঁড়ে একদিন সোজা নেমে যাবো নরকের উত্তপ্ত লাভায়। নয়তো আমার ছেলের লাল রঙের ফুটবলটার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকবো পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে- যে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য মহাশূন্যের মতো অনন্ত। সবাই বলে, এটা নাকি আমারই মানসিক সমস্যা। যে সমস্যায় পাখির ডানার পালকেও কেউ কেউ দেখে ঝলসানো ছুরির ফলা। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলাম। সব শুনে সেও ফিসফাস করে বললো আমায়, তারও আছে নাকি ভেঙে যাওয়ার ভয়।

অথচ যুবক বয়সে এই আমি কতো পাহাড় ডিঙ্গালাম! ভার্সিটির বন্ধুরা মিলে ট্যুরে যেতাম। পাহাড়ি ভল্লুকের মতো মেঘ ধরতাম বুনো থাবার ফাঁদে। তখন কোন হাইট ফোবিয়া তো ছিল না, বরং ছিল মেঘ হয়ে না জন্মানোর অভিমান।

ভরদুপুরে অনেক ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেও পা আমার শিরশির

করে। কি জানি, মাটির নিচ থেকে কেউ পা ধরে হেঁচকা টেনে নিয়ে যাবে না তো অন্ধকারের জন্মান্ধ প্রাসাদে? পতনের আতঙ্ক থেকে বাঁচতে বনের কাছে যাই। গাছকে বলি, বাঁচাও! তোমাকে এভাবে প্লিজ চিরকাল জড়িয়ে থাকতে দাও। গাছটাও অবাক করে দিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের মতো বলে তারও আছে নাকি পড়ে যাওয়ার, ভেঙে যাওয়ার দুরারোগ্য ভয়।

আকাশ উল্টে ছড়িয়ে পড়ছে পায়ের কাছে, বাক্স বাক্স বিল্ডিংগুলো ঝুলে আছে মাথার উপর। সেখান থেকে একটা পরীর মতো মেয়ে হাত নেড়ে হাই জানায়। আমিও বলি তাকে, হ্যালো সুইটি! একটা পাখি কোথা থেকে এসে উড়তে থাকে চোখের সামনে- যেন আমার এ অবস্থা দেখে সে বিদ্রুপ করছে। আমি আর না পেরে কেঁদে ফেলি। আমার কান্না দেখে নিষ্ঠুর পাখিটা হাসে। তার হাসির প্রতিধ্বনি সারা আকাশে। পাখিটা গান গেয়ে গেয়ে বলে, তোমার হয়তো অনেককিছু আছে- ক্ষমতা, সম্মান, খ্যাতি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিদেশ ঘোরার ভিসা। কিন্তু কি আছে আমার মতোন এক জোড়া ডানা? এইখানেই তুমি ধরা।

নিজেকে আমার খুবই ফালতু আর বিরক্তিকর লাগে। পাখি না হই, অন্তত একটা ঘুড়ি হওয়ার যোগ্যতা কি আমার নেই? কিন্তু ইয়া মোটা, কিম্ভুত সাইজের একটা ভুড়ি নিয়ে কি করে হবো বলো ঘুড়ি! আমি সেই ভোদাই ইকারুস, ডানা গেছে পুড়ে যার উচ্চাকাঙ্খার আগুনে।

ধুর, চারপাশে সবাই ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে উপরে আর আমি আছি কি ছাতামাথা পতনের ঘোরে। কেন, আমি কি দুনিয়ার সব দীন-দুঃখী পতনকে দত্তক নিয়ে বসে আছি, আমি কি ওদের সৎ বাপ? না, আমাকে অনেক উপরে যেতে হবে। মেঘের চেয়েও উঁচুতে, যেখানে ঈশ্বরের আঙ্গুর বাগান। আমি আর ঈশ্বর পানপাত্র হাতে একসাথে করবো চিয়ার্স। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি বসবে আমার কাঁধে।

তাই দেখে ঈশ্বরও মনে মনে হবে কিঞ্চিৎ জেলাস। তা না, সারাক্ষণই আমার বিশ্রী অদ্ভুত একটা ভেঙে যাওয়ার ভয়ের অভ্যাস।
আমার বউ সারাক্ষণ উৎসাহ দেয়, অনেক উপরে উঠতে হবে তোমাকে। ছোটবেলায় বাবাও বলতো একই কথা। কলিগরাও বলে, বস আপনাকে দিয়েই হবে। কিন্তু কি যে হাতির ডিম হবে তা নিজেরাও কি তারা জানে?!

আমি ঠিক জানি এই পড়ে যাওয়ার, ভেঙে যাওয়ার ভয় আমার জীবনে যাবে না। কারণ, আই এম ইন এ রিলেশনশিপ উইথ পতন। ওহ ইয়েস ব্রো, আই এম ইন লাভ উইথ দ্য উইয়ার্ড পতন। এনি প্রবলেম? ফাক ইওর প্রবলেম! আই লাভ ইউ পতন- লাভ ইউ বেইবি সো সো মাচ। আই লাভ ইউ হানি, ট্রাস্ট মি- লাভ ইউ এ লট!!

ছাদের ভবঘুরে খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়ে বেরিয়ে থাকা রডের সাথে বহুক্ষণ ঝুলে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাটাকে জিভ বের করে ক্যাচ ধরতে ছুটে আসে একটা তাগড়া কালো তৃষ্ণার্ত কুকুর। আর আমাকে ক্যাচ ধরতে এগিয়ে আসে মহাকালের অসাড়, বিবর্ণ জিভ।

নির্দয় কসাই

সারি সারি কফিনে রেখে দেওয়া মৃত ইচ্ছার শিয়রে
আমরা শুধু এক হতভম্ব নির্দয় কসাই।
কারণ আমরাই জারজ সন্তানের মতোন গলা টিপে
নিঃশব্দে খুন করি আমাদের অপরূপ ইচ্ছাগুলিকে।
অন্ধ কারিগরের মতো পেরেক ঠুকে ঠুকে আমরা
আকৃতি দিতে চাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু গোঁজামিল দায়িত্ব
আর কর্তব্যের দোহাই। রক্তাক্ত ইচ্ছাগুলো তখন
মহান ঈশ্বরের নামে বলি হওয়া ভ্যাড়ার পালের মতো
নেতিয়ে পড়া কণ্ঠে জানায় সবশেষ প্রতিবাদ:
ভ্যা.......... ভ্যা.............. ভ্যা.................

আয়নার সামনে এক আত্মমুগ্ধ হন্তারক দাঁড়িয়ে ছিলো
ছুরি হাতে। যে ছুরিটা কয়েক বছর হলো ভোঁতা হয়ে গেছে
তার মালিকের ভোঁতা হৃদয়ের সংস্পর্শে।
ছুরির ফলা হয়ে আমি তোমার জন্য খুঁড়ি
মরুভূমির তপ্ত বালু। সেই বালুর গোরস্থানে
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকা নীলাভ জল বেরিয়ে আসে
নিষ্পাপ আসামীর মতো আর কাতর নিঃশ্বাসে ডেকে ওঠে:
ভ্যা.......... ভ্যা.............. ভ্যা.................

তোমার কাছে আমি এক নেহাৎ ক্রীতদাস প্রেমিকা-
পৃথিবীর সব কাজের জঞ্জাল শেষ হওয়ার পর
আমরা দেখা করবো বলে বসে আছি চালকবিহীন ট্রেনে।
গাধার মতো ভাবছো প্রেমকে ফাঁকি দিয়ে
কাজের পাথুরে হাতে কখন মেলাবে হাত।

তুমিও ক্রীতদাস প্রেমিক, যে সকাল সন্ধ্যা
পিঠ পেতে নেয় অমরত্বের ক্ষুধার্ত চাবুক
আর তোমার প্রেমহীনতার চাবুক বৃষ্টি হয়ে ঝরে
আমার চোখে। ঢেউ এসে ধুয়ে দেয় সমুদ্রের
আকাশকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা হতে জাগা প্রবাল দ্বীপ।
অসমাপ্ত ইচ্ছাগুলো সূর্যের শেষ আলোয় ডানা বেঁধে
গাংশালিকের ঝাঁক হয়ে উড়ে যায় রাতের কোটরে।
সবাই চলে গেলে আমাদের ভিতরের নির্দয় কসাই
বের হয়ে এলে আমরা তাকেই জড়িয়ে ধরি।
প্রেম করার ভাণ করে সে গিলে খায় জন্মস্বাধীন ইচ্ছার ঘুড়ি।
প্রতিবার তাকে চুমুর সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড পায় একেকটা ইচ্ছা
আর মরে যাওয়ার আগে অভিমান করে বলে শুধু:
ভ্যা.......... ভ্যা.............. ভ্যা.................

নীল ঋতুস্রাব

এই নীল ঋতুস্রাব হলো সেই অভিশপ্ত রাজকন্যার কান্না
যাকে কেউ কখনো ভালবাসে নি।
তার জোনাকির মতো আত্মমগ্ন রূপ, ভায়োলিনের মতো কণ্ঠ
আর আকাশ ভরা মেঘের মতো কল্পনাপ্রবণতা নিয়ে
সে ছিল আজন্ম একা।
এক দস্যু জাদুকর তার হৃদয় চুরি করে নিয়ে
রেখে দিয়েছিল অ্যাকুরিয়ামের ভিতর
পোষা পিরানহাদের প্রিয় খাদ্য হিসাবে।
রাজকন্যা অন্ধ বিশ্বাসে প্রতিদিন বসে থাকতো
সেই পথের পাশে, যে পথে ফিরবে বলে
কথা দিয়েছিল ধূর্ত জাদুকর।
ঘোড়ার খুরে আর অসংখ্য পথচারীদের পায়ে পায়ে
ধুলা উড়ে ভেসে যেত মহাকাশে-
কিছু ধুলা ভালবেসে থেকে যেতো চোখের আকাশে-
ধুলা জমতে জমতে দৃষ্টিসীমায়
সে হয়ে যায় অন্ধ আর বৃদ্ধ এক বিরহী নারী।

তার দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়তো যে অশ্রু
তা এতোই টলটলে আর মধুর ছিল যে সারি সারি পিঁপড়া
অশ্রুপান করতে আসতো দূর দূরান্ত হতে।
ফলত, পিঁপড়াগুলোও হয়ে গিয়েছিল চিরতরে অন্ধ।
অন্ধ পিঁপড়াগুলোকে খুঁটে খেয়েছিল যে ক্ষুধার্ত নীল পাখির দল
তারাও কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছিল
একই অন্ধত্বের অভিশাপে। বনের চারপাশে
ঘিরে ফেলেছিল ব্যাধের দল এই বিরল প্রজাতির

নীল পালকের পাখি শিকার করতে।
অন্ধ পাখিগুলো আকাশ ভেবে ডানা বাড়িয়ে দিয়েছিল
ব্যাধেরই ক্ষমাহীনতার জালে।
এই নীল ঋতুস্রাব হলো সেই আকাশরঙা পাখিদের কান্না
যে নিঃশব্দ কান্না এখনও শুনতে পায় শিশুরা-
তাই ঘুমের ভিতর এখনও মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে তারা।

এই ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাবিহীন জন্মের উত্তাল সমুদ্রের দিকে
তাকিয়ে দেখি, কতো আক্রোশে শত শত ঢেউ
আছড়ে পড়ছে তীরে। পৃথিবী শিখে গেছে ভীষণ চালাকি-
কেউ অভিযোগ জানানোর আগে তাকে নিরস্ত করতে হয়
প্রতিঅভিযোগ দিয়েই। কান্নার বিরুদ্ধে কান্না,
ভাবনার বিরুদ্ধে ভাবনা, হাসির বিরুদ্ধে হাসি,
নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গতা
অভিমানের বিরুদ্ধে অভিমান, প্রতিশোধের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ
প্রস্তুত হয়ে আছে চিরশত্রু দুইটা দেশের সেনাবাহিনীর মতো।
হঠাৎ গায়ে লাগে রোদ-
ভুলে যাই বিশ্বলোক
কসাইয়ের ফালি ফালি কাটা মাংসের মতো খুশি হয়ে উঠি
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। জন্মানোর আগেই যে জন্মান্ধ ক্রীতদাস-
পণ্য কেনার জন্য পৃথিবীতে বারবার ফিরে আসো
একাকিত্ব ভোলার চেষ্টায় রত
এক যুদ্ধকালীন অসহায়ত্ব-
তবুও তোমাকে ভাল লাগে বেশ।
নীল ঋতুস্রাব কেবলই পাতালগামী হলে জাগে না আর খেদ।

পালাই, পালাই

উৎসর্গ: দাস বন্ধুকে (অভিজিৎ দাস)

এই ঘরে সবাই ঘুমে নরম গলে যাওয়া মোমের মতোন
এমনকি দারোয়ানও সারাদিনের পাহারা শেষে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিচ্ছে পাহারা জেগে ওঠার দুঃস্বপ্নকে।
এই ফাঁকে উঠে পড়ো চোর!
তুমি আর আমি পা টিপে টিপে কোথাও কোন ধাক্কা না খেয়ে
পালিয়ে যাবো তেপান্তরের জোছনায়।
ঘাসে বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে অনেক আয়েস করবো
আর ঝড়ো বাতাস খাবো যেন সুস্বাদু, লোভনীয় খাবার।
আস্তে করে উঠে পড়ো পাকা, বদমাশ চোর আমার!
যদিও জীবনে করি নি চুরি কারো একটা পেন্সিল বা ইরেজার
তবু আমরাই চোর, মাথা নিচু...
চিরকাল তোমাদের জমকালো সামাজিক মঞ্চে।

এখানে প্রতিটা ফুল জেনারেটরের মতো গরম
হয়ে আছে উৎপাদনের তাপে-
ভালবাসতে গেলে বনে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঘ-সিংহ
করে ওঠে গর্জন। নিউরনে ভুল করে পড়ে গেছে আঠা-
তাই জট পাকিয়ে যাচ্ছে ভাবনা চিন্তা।
লাইফ সাপোর্টে নিথর যে পড়ে আছে তার নাম বিশ্বাস।
তারই শত্রুর দোকানের অক্সিজেন কিনে নিচ্ছি নিঃশ্বাস।
ভাল লাগে না, আছে শুধু ভাল লাগার ভাণ।
এক উন্মাদ লেখকের উপন্যাসে গৌণ চরিত্র নিয়ে
ঘুরি ফিরি, বিড়ি টানি আর সাদা পৃষ্ঠায়
কালো অক্ষর হয়ে কাটাই দ্বিমাত্রিক জীবন।

তবু আয়োজন! এতো এতো স্বপ্নের ছুটে বেড়ানোর শব্দ-
ঘোড়ার খুরের চেয়েও তীক্ষ্ণ। বৃষ্টির চাইতেও অবিরাম।
চলো নিধিরাম! এই ফাঁকে ভেগে যাই অহঙ্কারের প্রাসাদ ছাড়িয়ে-
এক দল পিঁপড়া দেখো হাসতে হাসতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
বিশাল একটা মরা গঙ্গাফড়িং। আমিও ভাগ বসাতে চাই
ওদের সাথে বাসী, টক টক গঙ্গাফড়িং-এর মাংসে।
ঝড়-বন্যার আভাস এখন থেকে লক্ষ্য রাখবো
গাছের চোখা ডালে বসে, যখন মনের ঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাসে
কেউ পিঠে হাত রেখে বলে নি, "ইশ"!
চল হে মুর্খ সাঙাত, পা টিপে টিপে সাবধানে
কোথাও কোন ধাক্কা না খেয়ে বের হয়ে যাই একেবারে।
সবাই ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, কখনো এটা না জানে না জানুক যে
একমাত্র এই ঘুমের সময়টাতে ওরা প্রকৃতপক্ষে জেগে থাকে,
স্বপ্নের বল্গাহীন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়।
বাকি সবটা সময় তারা অঘোরেই ঘুমায়।

(অসংখ্য নাকে নাকে নাক ডাকার শব্দ এবং নিঃশব্দে দুই চোর উধাও।)

বৃষ্টিতে ভেজা মাইন

শ্রেণীহীন বিশ্বের বাজারে বসে বসে শ্রমিক তোমার মতো
আমার মনেও কি জাগে না শ্রেণীঘৃণা? আমিও কি জানি না
সকল ফুলের সৌরভের চেয়ে উৎকৃষ্ট শোষকের পোড়া মাংসের গন্ধ?
আমিও তোমার মতো বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া একখণ্ড মাইন-
যে কখনো বিস্ফোরিত হবে না। না হয়, না হোক
তবু চলো এই মধ্যরাতের শীতে ভাগ করে খাই
তোমার পাতার বিড়ি আর আমার সিগারেট।
সামনে তাকিয়ে দেখি ঝরে যাওয়া উল্কার নশ্বর আলো
চোখ বন্ধ করে মনে মনে কিছু চাইতেও পারো,
আমি তো চাই আরো অনেক উল্কা ঝরা দেখতে বুড়ো হওয়া পর্যন্ত।
নাইটগার্ডের হুইসেল আর কুকুর জানান দেয় এখন ঘুমানোর সময়
আর আমাদের পা বাতাসের মতো হালকা হয়ে ওঠে
পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর নেশায়। আলিঙ্গন যতো কঠিন হয়
কচ্ছপেরা ততো খুঁজে পায় খোলসের বেড়াজাল। আমিও তোমার
তাক করা ট্রিগারের বাইরে না জানি- বাইরে সমুদ্রের নীলাচল।
তার তীরে সানগ্লাস পরে বসে থাকে সবাই যে যার
শ্রেণীময় ছাতার নিচে।

শ্রেণীহীন বিশ্বের বাজারে বসে বসে শ্রমিক তোমার মতো
আমার মনেও কি জাগে না শ্রেণীঘৃণা?
আমিও কি জানি না সকল ফুলের সৌরভের চেয়ে উৎকৃষ্ট
শোষকের পোড়া মাংসের গন্ধ?
আমিও তোমার মতো বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া একখণ্ড মাইন-
যে কখনো বিস্ফোরিত হবে না। না হয়, না হোক
তবু একটুখানি বিস্ফোরণের আঁচ রেখে দিও ঘৃণার কবরে শুধু না
ভালবাসার নিশ্চিন্ত শিথানেও।

জলাবদ্ধ

আকাশ কি করে পেলো আমার চোখ
সারাক্ষণ ঝর ঝর করে যাচ্ছে ঝরে বর্ষণ
যেন অগুণতি ফুটো হওয়া একটা মেটে কলসির
পানি ভরা জীবন।
লা লা লা লা লা লা উম উম উমম উ উ আ

দুঃস্বপ্নের মতো হাজির সমুদ্রের ঘোলাটে জল
আর নামে না-
কোন অবিকল পাড়া দখলকারী মাস্তান
কারো কাকুতি শোনে না-
তুমি রয়েছো সাত তলার উপরে
সাত আসমান ছাড়িয়ে ঈশ্বরের বসত
জোয়ারের এই আস্ফালন
গুটিয়ে থাকে তোমার পদতলে
পোষ মানা হাতির মতোন।
তার জলজ শুঁড় তুলে তেড়ে আসে
ভেঙে দিতে আমার কুঁড়েঘর।
লা লা লা লা লা লা উম উম উমম উ উ আ

সাগরেও কেউ কেউ দেয় বাঁধ
তবু আমাদের দুঃখের সাগর তো অবাধ
ঝিনুকের হাটে মালা বেচে কিনি ঝুলে পড়ার ফাঁস।
ডুবে গেছে সবই- সেগুন কাঠের বাক্স, বিয়ের শাড়ি
ছবিওয়ালা কিছু বই, তার সাথে ন্যাপথলিন
ছেলের খেলনা গাড়ি, শেষ ভরসা খাবার পানি

যাচ্ছে ডুবে সবই- উত্তাল ঢেউয়ের কবরে
গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে মেঘলা সূর্যাস্তের বহর।
লা লা লা লা লা লা উম উম উমম উ উ আ

ছিল না রেডিও কিংবা মোবাইল ফোন
ঝড়ের পূর্বাভাস সেদিন দেয় নি আভাস
সমূহ বিপদের আগমন।
চার দিন হলো শেষ, জামাই আমার নিরুদ্দেশ
গভীর সমুদ্রে ধরতে গিয়ে গভীর জলের মাছ
সে নিজেই হলো ধরাশায়ী এক মানবিক মাছ, অসময়ের জালে।
লা লা লা লা লা লা উম উম উমম উ উ আ

আকাশ কি করে পেলো আমার চোখ
সারাক্ষণ ঝর ঝর করে যাচ্ছে ঝরে বর্ষণ
যেন অগুণতি ফুটো হওয়া একটা মেটে কলসির
পানি ভরা জীবন।

বই অবিকল্প

প্রকাশন
ঘাসফুল